একজন অদরিদ্রের দারিদ্র চিন্তা:
বাংলাদেশে দারিদ্রের রাজনৈতিক-অর্থনীতি[1]

ড. আবুল বারকাত

ব্যাপক জনগোষ্ঠির ক্রমবর্ধমান ও বহুমাত্রিক দারিদ্র – এ দেশের প্রধান সমস্যা। চৌদ্দ কোটি মানুষের এদেশে ‘দারিদ্র’ যে সবচে রূঢ় বাস্তবতা এবং কঠিন এক উদ্বেগের বিষয়, তাতে কেউই এখন আর দ্বিমত পোষণ করেন না। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, অদূর ভবিষ্যতেও এ উদ্বেগের নিরসন হবে না। এ কথা তো ঠিক যে সুস্থ-সবল-চেতনাসমৃদ্ধ ভেদহীন মানুষ সৃষ্টিই ছিল স্বাধীনতার মূল লক্ষ্য। কিন্তু তা অর্জিত হয়নি। তাই মানব-কল্যাণমুখী রাষ্ট্র-সমাজ-অর্থনীতি গঠনপ্রক্রিয়ায় ‘দারিদ্র’ বিষয়টি বারবার-প্রতিনিয়ত উত্থাপন জরুরি। বিষয়টির পূর্ণমূল্যায়ন জরুরি। দারিদ্রের বহুমাত্রিকতা, বিমোচনের শ্লথ গতি এবং সেই সঙ্গে আমাদের দারিদ্র বিষয়ে দাতাগোষ্ঠি, বিশেষ করে বিশ্বব্যাংক ও আই এম এফ-এর (অতি)-আগ্রহ ইত্যাদি কারণে বিষয়টির খোলামেলা, যুক্তিনির্ভর, জ্ঞানসমৃদ্ধ মূল্যায়ন- পূনর্মুল্যায়ন এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হবে।

“বাংলাদেশে দারিদ্র” বিষয়ে এ দেশের মানুষের মনে প্রশ্নের শেষ নেই; প্রশ্ন শেষ হবার কোনো শর্তও সৃষ্টি হয়নি। তাই দারিদ্র সংক্রান্ত উদ্বেগ সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করতে চাই। হতে পারে উদ্বেগ উদ্বেগই থেকে যাবে। সম্ভবত অনেক প্রশ্নের উত্তর আমরা এ মুহূর্তে পাবো না। কিছু প্রশ্নে মতানৈক্য থাকবে, সেটাও স্বাভাবিক। নতুন প্রশ্ন উত্থাপিত হবে, তা আশার কথা। এসব বিবেচনা থেকে কয়েকটি বিষয় উত্থাপন জরুরি।

আমাদের দারিদ্র চিন্তা আসলে চিন্তারই দারিদ্র

দারিদ্রের মর্মার্থ না জানলে দারিদ্র দূরীকরণ বা হ্রাসকরণ বললে কি বুঝবো? আমার মনে হয় দারিদ্রের সংজ্ঞায়নে আমরা ব্যর্থ হয়েছি। আত্মপ্রবঞ্চনা করছি। আমরা দরিদ্র মানুষের দৃষ্টিতে দারিদ্র দেখি না। এমনকি আমাদের মতো অদরিদ্রদের দারিদ্র পরিমাপের প্রয়াসও দরিদ্র মানুষের দৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়েছে বলে মনে হয়। কারণ, মাথাপিছু নির্দিষ্ট পরিমাণের আয়, মাথাপিছু দু'হাজার ১২২ কিলোক্যালরির নীচে খাদ্য ভোগ, সাক্ষরতা বৃদ্ধির সঙ্গে নিরক্ষরতা হ্রাস না পাওয়া, প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবার সুযোগ সৃষ্টি করা (দরিদ্ররা সে সুযোগ গ্রহণ করুক বা না করুক) — দারিদ্র সংজ্ঞায়ন ও পরিমাপণে এসব স্থুলতা অতিক্রম করতে আমরা অক্ষম হয়েছি। আর এসব কারণেই ‘দরিদ্র জন্মসূত্রেই দরিদ্র হতে বাধ্য’— এ ধারণা আমাদের গবেষকদের বোধের দারিদ্রই নির্দেশ করে। সে কারণেই দারিদ্র দূরীকরণ বা হ্রাসের প্রেসকিপশনগুলোও অনুরূপ স্থুল।

“দারিদ্র” আমার মতে নেহায়েত এক অর্থনৈতিক প্রপঞ্চ নয় যা ‘আয়’ এবং/অথবা ‘খাদ্য পরিভোগ’ দিয়ে মাপা হয়। যেমন বলা হয় – যদি কেউ দৈনিক ৬৭ টাকার কম আয় অথবা ২১২২ কিলো ক্যালরির কম খাদ্য ভোগ করেন তিনিই দরিদ্র, আর তার অবস্থাটা “দারিদ্র”। আমার মতে যা কিছু মানুষের পরিপূর্ণ জীবন প্রাপ্তিতে বাধা সৃষ্টি করে সে সবই দারিদ্রের মানদণ্ড। দারিদ্র হলো সুযোগের অভাব বা সমসুযোগের অভাব। আর বৈষম্য-বঞ্চনা থেকেই এর উৎপত্তি। এ বৈষম্য-বঞ্চনা প্রধানত অর্থনৈতিক হলেও শুধুমাত্র অর্থনৈতিক নয়।

সরকারি ও দাতাগোষ্ঠির দারিদ্র সংক্রান্ত দলিলপত্র প্রায়ই সরলীকৃত দারিদ্রের আপাতন (incidence of poverty) কে সবচে' বেশি গুরুত্ব দেয়। এই ভিত্তিতেই বলা হচ্ছে, বাংলাদেশে দারিদ্র হ্রাস পেয়েছে

[1] “একজন অদরিদ্রের দারিদ্র চিন্তা: বাংলাদেশে দারিদ্রের রাজনৈতিক-অর্থনীতি” বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি আয়োজিত আঞ্চলিক সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট ভবন: ১৫ জুলাই ২০০৬।

১৯৮৫/৮৬ সালের ৫৫.৭ শতাংশ থেকে ২০০৪ সালে ৪০.৪ শতাংশে (head count ratio based on DCI method)। অর্থাৎ গত প্রায় ২০ বছরে দারিদ্র হ্রাস পেয়েছে প্রায় ৩৮ শতাংশ। অথচ একই সরকারি দলিল বলছে দরিদ্র মানুষের নিরংকুশ সংখ্যা বেড়েছে। অর্থাৎ এমনকি সরকারি স্থুল হিসেবকে আমলে নিয়েও স্পষ্ট বলা যায় যে, তুলনামূলক দারিদ্র (শতাংশ হিসেবে) হ্রাস পেলেও মোট দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং পেতে থাকবে। তিরিশ বছর আগে ৭০ ভাগ মানুষ দারিদ্রসীমার নীচে বাস করতো। তখন মোট দরিদ্রের সংখ্যা ছিল ৩ কোটি। এখন সরকারি হিসেবে ৪০ ভাগ মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে বাস করলেও দরিদ্র মানুষের সংখ্যা প্রায় ৬ কোটি। এ দেশে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধির হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের তুলনায় বেশি। সুতরাং দারিদ্রের আপতন-ভিত্তিক স্থুল হিসেবপত্তরও নির্দেশ করে যে, দেশে দারিদ্র হ্রাস পায় নি।

দারিদ্র হতে পারে আয়ের দারিদ্র, কর্মহীনতার দারিদ্র, স্বল্প-মজুরীর দারিদ্র, ক্ষুধার দারিদ্র, আবাসনের দারিদ্র, শিক্ষার দারিদ্র, স্বাস্থ্যের দারিদ্র, অস্বচ্ছতা-উদ্ভূত দারিদ্র, পরিবেশ-প্রতিবেশ বিপর্যয়ের দারিদ্র, নিরাপত্তাহীনতা-উদ্ভূত দারিদ্র, রাজনৈতিক দারিদ্র, প্রান্তিকতা উদ্ভূত দারিদ্র (নারী, ধর্ম, ক্ষুদ্র জাতি-গোষ্ঠি, চরের মানুষ), মানস-কাঠামোর দারিদ্র ইত্যাদি। আমি মনে করি দারিদ্রকে দেখতে হবে সব ধরনের দারিদ্রের পরস্পর সম্পর্কিত যৌথ রূপ হিসেবে যেখানে প্রতিটি রূপ ভিন্ন ভিন্নভাবে দারিদ্রের নির্দিষ্ট অংশকে প্রতিফলিত করে মাত্র। তবে এমনও হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক মুহূর্তে দারিদ্রের কোনো এক বা একাধিক রূপ অন্যসব রূপের তুলনায় অধিক গুরুত্ব বহন করে। সেই সাথে এ কথাটি স্পষ্ট হতে হবে যে দারিদ্র হ'তে পারে তুলনামূলক অথবা নিরঙ্কুশ। সুতরাং আমার বিশ্বাস 'দারিদ্র বিমোচন' বললে আমরা বুঝবো দারিদ্রের কোনো কোনো রূপের তুলনামূলক হ্রাস আবার কোনো কেনোটির নির্মূল বা উচ্ছেদ।

আমার সার বক্তব্য এক বাক্যেও শেষ করা যেতে পারে। আর তা হলো: যেহেতু দারিদ্র বিষয়টি শেষ পর্যন্ত শোষণ সৃষ্টিকারী কাঠামো উদ্ভূত (structural) সেহেতু স্থায়ীভাবে দারিদ্র বিমোচন করতে হলে বর্তমান কাঠামোটি ভেঙ্গে তার জায়গায় নূতন কাঠামো বসাতে হবে; আর যুক্তিগতভাবেই এ কাজটি পারে দরিদ্র শোষিত মানুষের স্বার্থরক্ষাকারী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। এ বক্তব্যে সাম্যবাদী মতাদর্শের গন্ধ আছে বিধায় অনেকেই বাতিলযোগ্য বিবেচনা করলেও যুক্তি হিসেবে বক্তব্যে ভুল নেই। ভুল-ভ্রান্তি থাকলে তা আছে সম্ভাব্যতা বিচারে। সে কারণেই বক্তব্য এক কথায় শেষ করা যাচ্ছে না। বক্তব্য এক কথায় শেষ করা যাবে না এ জন্যেও যে আমরা সবাই মিলে আপাতত ধরেই নিয়েছি যে সম্ভবত: পুঁজিবাদী কাঠামোতেই আমাদের চলতে হবে; ধরেই নিয়েছি যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ৮-১০% হলেই দারিদ্র স্বয়ংক্রিয়ভাবে দূর হয়ে যাবে; ধরেই নিয়েছি যে যেকোনো শর্তে প্রচুর বিদেশি বিনিয়োগ হলেই দারিদ্র দূর হয়ে যাবে; ধরেই নিয়েছি যে মাত্রা যাই হোক না কেন বাজার অর্থনীতির আবরণের মধ্যেই দারিদ্র হ্রাস বিমোচন হতে পারে; ধরেই নিয়েছি যে আমাদের দেশে বাণিজ্য পুঁজি ও ব্যাপক-বিস্তৃত কালো টাকার পুঁজিকে– যার পুঞ্জিভূত পরিমাণ আনুমানিক ৭ লাখ কোটি টাকা– যে কোনোভাবে শিল্প পুঁজিতে রূপান্তর করলেই দারিদ্রের অনেক রূপ হাল্কা হয়ে আসবে; ধরেই নিয়েছি যে বুদ্ধি দিয়ে বিশ্বায়ন-এর সুযোগ (!) গ্রহণ করতে পারলেও দারিদ্রাবস্থা উপশম হবে ইত্যাদি। এসব ধরে নেয়ার পিছনের যুক্তি কতটা যুক্তিসিদ্ধ ও বাস্তবসম্মত এ নিয়ে আজকের বিতর্ক-আলোচনা নয়। সুতরাং ভুল-শুদ্ধের বিচার না করেই 'ধরে নেয়া' অনুসিদ্ধান্ত মেনেই আমরা দারিদ্র বিমোচনে সচেষ্ট। প্রকৃতপক্ষে এ আমাদের চিন্তারই দারিদ্র নির্দেশ করে।

দরিদ্র কে? বাংলাদেশে আসলে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা কত?

আমার ধারণা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন সংবিধানের "রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি" ও "মৌলিক অধিকার" সংক্রান্ত ৮ থেকে ৪৩ পর্যন্ত অনুচ্ছেদে বর্ণিত জনগণের মৌলিক চাহিদা থেকে বঞ্চিতরাই দরিদ্র। এ হিসেবে বাংলাদেশের শতকরা ৯৫ ভাগ মানুষই দরিদ্র। অর্থাৎ সংবিধানকে দরিদ্র

পরিমাপণের ভিত্তি হিসেবে ধরলে আমাদের "প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক যে জনগণ" (অনুচ্ছেদ ৭.১), তাদের ৯৫ ভাগ দরিদ্র। কারণ ১৪ কোটি মানুষের এ দেশে দারিদ্রের বহুমাত্রিক রূপ হবে এরকম: আয়ের অথবা খাদ্য গ্রহণের নিরিখে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ৬-৭ কোটি (যা সংবিধানের ১৪ ও ১৫ অনুচ্ছেদের পরিপন্থী)। প্রায় ৮ কোটি মানুষ এখনও কার্যত নিরক্ষর এবং প্রকৃত শিক্ষা-সুযোগ বঞ্চিত (যা সংবিধানের ১৭ অনুচ্ছেদ, বিশেষত ১৭গ অনুচ্ছেদের সম্পূর্ণ পরিপন্থী)। প্রায় ৯ কোটি মানুষ প্রাথমিক স্বাস্থ্য-সেবার সুযোগ বঞ্চিত (যা সংবিধানের ১৮ অনুচ্ছেদের পরিপন্থী)। প্রতিবছর যে ৬ লাখ মানুষ এদেশে মৃত্যুবরণ করেন তার অর্ধেকই পাঁচ বা আরও কম বয়সের শিশু। আরও লজ্জাজনক কথা, ৫০% ক্ষেত্রে মৃত্যুর কারণ দারিদ্র-উদ্ভুত। নিউমোনিয়ার চিকিৎসায় মাথাপিছু ব্যয় মাত্র ১৩ টাকা, ডায়ারিয়ার ১৭ টাকা, হামের ১২ টাকা এবং যক্ষ্মার ৯০০ টাকা। উল্লেখ্য, যক্ষ্মা রোগীর সংখ্যার দিক থেকে পৃথিবীতে আমাদের অবস্থান চতুর্থ শীর্ষে (সংবিধানের ১৫ ও ১৮.১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অবস্থা এমন হবার কথা নয়)। সাক্ষর-নিরক্ষর মিলে প্রায় ৩ কোটি মানুষ (যাদের অধিকাংশই যুবক) এখনও বেকার (সংবিধানের ১৫খ ও ২০ অনুচ্ছেদ কর্মের অধিকার নিশ্চিত করে)। প্রায় ১১ কোটি পরিবার এখনও বিদ্যুৎ সুবিধা বঞ্চিত (অথচ সংবিধানের ১৬ ধারা এ সুবিধা নিশ্চিত করে)। সীমিত আয়ের ব্যাপক সংখ্যক মানুষ প্রকৃত অর্থেই দুর্দশাগ্রস্ত এবং দুর্দশা ক্রমবর্ধমান। এর অন্যতম কারণ দ্রব্যমূল্যের (খাদ্য ও খাদ্য বহির্ভুত) ঊর্ধ্বগতির সঙ্গে সঙ্গে জীবনযাত্রার ব্যয় এবং বেকারত্ব বৃদ্ধি। গত পাঁচ বছরে শুধু মোটা চালের দাম বেড়েছে কেজি প্রতি ১০ টাকা। খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ম্ভরতা অর্জিত হয়েছে কিন্তু দরিদ্র মানুষের খাদ্য-পরিভোগ বৃদ্ধি পায়নি। অন্যদিকে বন্টন-অসমতা বৃদ্ধি পেয়েছে (এসবই সংবিধানের ১৩, ১৫ ও ১৯ অনুচ্ছেদ-এর সঙ্গে সাযুজ্যহীন)। দেশের অধিকাংশ নারী, শিশু ও প্রবীণ নিশ্চিতভাবেই বঞ্চিত (যা সংবিধানের ১০, ১১, ১৫, ১৭, ১৮ ও ২৮ অনুচ্ছেদের পরিপন্থী)। বিরাট এক জনগোষ্ঠি নিশ্চিতভাবেই উত্তরোত্তর অধিক হারে নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়ছেন। খুন, ধর্ষণ, মাস্তানি-রাহাজানি এবং মহিলা ও শিশুদের প্রতি সকল ধরনের নির্যাতনসহ নিরাপত্তাহীনতার সকল কারণই বাড়ছে। বাড়ছে অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক নিরাপত্তাহীনতাও (এসবই সংবিধানের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি ও মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত সকল ধারার পরিপন্থী)। ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও আদিবাসী মানুষের বঞ্চনা চিরস্থায়ী রূপ ধারণ করেছে। শত্রু/অর্পিত সম্পত্তি আইনের মারপ্যাচে ইতোমধ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের ৫০ লাখ মানুষের ২০ লাখ একর ভূ-সম্পত্তি জবরদখল করা হয়েছে। এর বর্তমান বাজার মূল্য কমপক্ষে দুই লাখ কোটি টাকা। এই জবরদখলকারীরা আমাদের জনসংখ্যার মাত্র ০.৪ শতাংশ (ক্ষমতাবান/ক্ষমতাধর গোষ্ঠিভুক্ত)। আর আদিবাসী মানুষ কি অর্থনীতি, কি শিক্ষা, কি স্বাস্থ্য — সব দিক থেকেই প্রান্তস্থ (এসব কিছুই সংবিধানের ২৭, ২৮, ও ৪১ অনুচ্ছেদের সম্পূর্ণ পরিপন্থী)।

সংবিধান দারিদ্রদূরীকরণে যা নিশ্চিত করার কথা বলছে আর বাস্তবে যা দেখছি, তা থেকে আমার হিসেব মতে মৌলিক চাহিদা পদ্ধতিতে জাতীয় ক্ষেত্রে দারিদ্র বিমোচনে সময় লাগবে ৩১০ বছর। বিষয়টি নিঃসন্দেহে উদ্বেগজনক। দারিদ্র নিরসন কর্মকাণ্ডে হয় মৌলিক পরিবর্তন নয়তো সংবিধানের ৮ থেকে ৪৩ পর্যন্ত অনুচ্ছেদের আমূল সংশোধন জরুরি (সেক্ষেত্রে সংবিধানের অন্যান্য ১০৬-টি অনুচ্ছেদেও বিভিন্ন মাত্রায় সংশোধন করতে হবে)। আমার মতে এক্ষেত্রে মধ্যপথের অবকাশ নেই। তাহলে দারিদ্র দূরীকরণে যে অবস্থায় আমরা উপনীত হয়েছি, তা বিশ্লেষণ করে এ কথা বলবো কি'না যে, এ বিষয়ে সংবিধান কার্যকরী নয়?

দারিদ্র উচ্ছেদ- না'কি দারিদ্রহ্রাস?

বিশ্বব্যাংকের প্রাক্তন প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. নিকোলাস স্টার্ন বাংলাদেশে এক লোকবক্তৃতায় বলেছিলেন, "আমার টেবিলে দারিদ্র উচ্ছেদ বা বিমোচন (alleviation অর্থে) শিরোনামে কোনো কিছু এলে আমি সেটা ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেলে দিই"। অর্থাৎ তার মতে দারিদ্র উচ্ছেদ সম্ভব নয়। বক্তব্যটি আমার কাছে অর্থনীতিবিদদের দারিদ্র বিষয়ক দর্শন-চিন্তারই দারিদ্র বলে মনে হয়। দারিদ্র উচ্ছেদ (eradication) ও দারিদ্র হ্রাস (reduction)— ধারণাগত দিক থেকে উভয়ই সঠিক। আসলে দারিদ্রের মাত্রা দু'টো— নিরঙ্কুশ দারিদ্র আর আপেক্ষিক বা তুলনামূলক দারিদ্র (relative poverty)। আমি মনে করি, মাথাপিছু দু'হাজার ১২২

কিলোক্যালরির নীচে ভোগ যদি নিরঙ্কুশ দারিদ্রের একটা মাপিকাঠি হয়, সেক্ষেত্রে এ মুহূর্তেই বাংলাদেশ থেকে নিরঙ্কুশ দারিদ্র উচ্ছেদ (হ্রাস নয়) সম্ভব। কারণ আমরা এখন যে পরিমাণ খাদ্য শস্য (ধান, গম, ডাল, ফলমূল, ইত্যাদি) উৎপাদন করি সেটাকে মোট কিলোক্যালরিতে রূপান্তর করে মোট জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল হবে মাথাপিছু প্রায় তিন হাজার কিলোক্যালরি। সহজ এই পাটিগণিত বাস্তবে কাজ না করার প্রধান কারণ হল বন্টন-বৈষম্য। আর সংবিধানের ১৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী এ বৈষম্য রাষ্ট্রের মূলনীতির পরিপন্থী। কারণ, বলা হচ্ছে "বন্টন প্রণালীসমূহের মালিক বা নিয়ন্ত্রক হইবেন জনগণ"। আসলে মূলনীতি শীর্ষক সংবিধানের ৮ অনুচ্ছেদে বর্ণিত অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা, ১৯ অনুচ্ছেদে বর্ণিত মানুষে-মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপের মাধ্যমে সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিতকরণের বিধানসহ কৃষি সংস্কার ও অন্যান্য জনকল্যাণমূখী কর্মকাণ্ড ছাড়া বন্টন বৈষম্য রোধের উপায় নেই।

নিরঙ্কুশ দারিদ্রের তুলনায় আপেক্ষিক দারিদ্র উচ্ছেদ বা নির্মূল সম্ভব নয়, হ্রাস সম্ভব। কারণ বিষয়টি তুলনামূলক। এক শ্রেণীতে পাঠরত দু'জনের পরীক্ষার ফল ভিন্ন হয় বিভিন্ন কারণে। আবার দু'জনের ফল ভিন্ন হতে বাধ্য, এ কথাও অসত্য হতে পারে। দু'জনের প্রথমজন যদি জন্মসূত্রে স্বল্প ওজনের (low birth weight) এবং সেই সঙ্গে দারিদ্রের কারণে অপুষ্টিবাহিত (বলা হয় জন্ম প্রক্রিয়ার দু'বছরের মধ্যে মস্তিষ্ক কোষের মূল বিকাশ ঘটে থাকে) আর দ্বিতীয়জন যদি ঠিক উল্টো বৈশিষ্ট্যের হয়, তাহলে দু'জনের পরীক্ষার ফল ভিন্ন হবে। আর দু'জনেই অভিন্ন বৈশিষ্ট্যের বাহক হলে (প্রথমজনকে দ্বিতীয়জনের বৈশিষ্ট্যে রূপান্তরিত করলে) কি তুলনামূলক ফল ভিন্ন হবে? আমাদের দারিদ্র গবেষকেরা এসব নিয়ে মাথা ঘামান বলে আমার জানা নেই। তবে আমার বিশ্বাস, অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে পরীক্ষার ফল বিষয়ক দারিদ্র হ্রাস নয়, উচ্ছেদই হবে। সামাজিক বৈষম্য-অবৈষম্যের বিচারে নিরঙ্কুশ দারিদ্র আপেক্ষিক আর আপেক্ষিক দারিদ্র নিরঙ্কুশ। নিরঙ্কুশ ও আপেক্ষিক দারিদ্রের মর্মার্থ অনুধাবনে বিষয়টি আমাদের দারিদ্রাবস্থা বিশ্লেষণ ও দারিদ্র উচ্ছেদ এবং/অথবা দারিদ্র হ্রাসের ক্ষেত্রে বিবেচনার জন্য সবিনয়ে পেশ করছি।

দারিদ্র ও উন্নয়ন পারস্পরিক সম্পর্ক: চিন্তা কাঠামোতে ভ্রান্তি

সরকার ও দাতাগোষ্ঠি প্রায়শই আমাদের বুঝিয়ে থাকেন যে, উন্নয়ন হলে দারিদ্র হ্রাস পাবে। আমি মনে করি উল্টো – দারিদ্র উচ্ছেদ হলে উন্নয়ন হবে অথবা দারিদ্র উচ্ছেদ টেকসই উন্নয়নের প্রধান পূর্ব শর্ত। আসলে উন্নয়ন বলতে সরকার ও দাতাগোষ্ঠি যা বুঝিয়ে থাকেন সে অর্থে তা হবে না। তারা উন্নয়ন বলতে মোট উৎপাদনের বৃদ্ধি এবং বৃদ্ধির হার অথবা মাথাপিছু জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি বুঝিয়ে থাকেন। আমি অন্তত ১০০টি দেশের নাম উল্লেখ করতে পারি যে সব দেশে এসব মাপকাঠিতে উন্নয়ন হলেও সেই সঙ্গে দারিদ্র হ্রাস পায়নি, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে বৈষম্য ও দারিদ্রের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং দারিদ্র বিমোচন উদ্দিষ্ট 'উন্নয়ন'-এর নতুন সংজ্ঞা প্রয়োজন। উন্নয়ন হতে হবে এমন একটি প্রক্রিয়া যা মানুষের চয়নের স্বাধীনতা নিশ্চিত করে, বিস্তৃত করে। এ অর্থে উন্নয়ন হতে হবে স্বাধীনতা মধ্যস্থতাকারী প্রক্রিয়া যেখানে জনগণের জন্য পাঁচ ধরনের চয়ন-স্বাধীনতা নিশ্চিত হতে হবে: অর্থনৈতিক সুযোগ, সামাজিক সুবিধাদি, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, স্বচ্ছতার নিশ্চয়তা ও সুরক্ষার বা নিরাপত্তার নিশ্চয়তা। উন্নয়ন দর্শন কৌশল যদি এসব স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে সক্ষম হয় শুধুমাত্র তখনই উন্নয়নের সঙ্গে দারিদ্র বিমোচিত হবে অথবা দারিদ্র বিমোচন টেকসই উন্নয়নের পূর্ব শর্ত হিসেবে কাজ করবে। এক্ষেত্রে উন্নয়নে দারিদ্র বিমোচন হবে লক্ষ্য, উপলক্ষ নয় (যেটা আমাদের ক্ষেত্রে উল্টো)।

বিশ্ব নেতৃবৃন্দ এখন "সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য" (Millennium Development Goals) নিয়ে ভাবছেন যার প্রথম লক্ষ্য হল "দারিদ্র ও ক্ষুধা নির্মূল করা" (২০১৫ সালের মধ্যে অর্ধেকে নামিয়ে আনা)। জাতিসংঘের MDG-তে যেহেতু রাষ্ট্র হিসেবে আমরা স্বাক্ষর করেছি সেহেতু আন্তর্জাতিক ফোরাম থেকে শুরু করে দেশের সংশ্লিষ্ট যে কোনো ফোরামে আমরা "দারিদ্র-ক্ষুধা নির্মূল/উচ্ছেদের" কথা জোরেশোরেই বলতে পারি। সেই সাথে অবশ্যই আমাদের বলতে হবে যে জাতিসংঘে যখন আমরা "দারিদ্র নির্মূল"-এ স্বাক্ষর করলাম তখন দারিদ্র হ্রাস

কৌশলপত্রে (PRSP) কেন "দারিদ্র হ্রাসের" কথা বলছি। 'নির্মূল' ও 'হ্রাস' তো এক কথা নয়। এ দ্বৈততা কেন? একি নেহায়েত দ্বৈততা না'কি কমিটমেন্ট-এর অভাব, প্রতিশ্রুতি ও সদিচ্ছার অভাব? এ বিষয়ে জোরে কথা বলে কি হবে তা জানি না, তবে যুক্তি থাকলে উচ্চকণ্ঠ হতে অসুবিধা কোথায়?

সরকারের দারিদ্র হ্রাস কৌশলপত্র নিয়ে আমরা দু'ভাবে ভাবতে পারি: প্রথমত: এ দেশের দরিদ্র মানুষের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট যা কিছু দারিদ্র বিমোচনে প্রয়োজন ছিল অথচ "কৌশল দলিলে" জায়গা পায়নি তা চিহ্নিত করা এবং উচ্চস্বরে বলা। যেমন দেশে ২.৫ কোটি বিঘার বেশি যে খাস জমি ও জলা আছে তা কিভাবে দরিদ্র মানুষের ন্যায্য হিস্যাতে রূপান্তরিত হবে (?); অথবা দরিদ্র বেকারত্বের (প্রধানত: যুব দারিদ্র) কি হবে (?); অথবা বন্ধ হয়ে যাওয়া শিল্প কল-কারখানা খোলা নিয়ে ভাবনাটা কি?; অথবা গত তিন দশকে বিদেশি ঋণ-অনুদানের প্রায় ১৫০,০০০ কোটি টাকার লুটপাট, আর প্রায় ৭০০,০০০ কোটি টাকার সমপরিমাণ কালো টাকার কি হবে? ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত: দারিদ্র হ্রাস কৌশলপত্রে এমন কি আছে যা দিয়ে দরিদ্র মানুষ বুঝবে যে দারিদ্র দূর হচ্ছে (?); বাস্তবায়ন কৌশলগুলো কি এবং তাতে দরিদ্র মানুষ কিভাবে অংশগ্রহণ করবেন? এক্ষেত্রে জনকল্যাণমুখী নাগরিক হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হতে পারে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে "নিজস্ব-দেশজ (home grown)" বিস্তারিত কৌশলপত্র প্রণয়ন করে সেটা প্রচার করা এবং যুক্তি থাকলে তা গ্রহণে সরকারকে বাধ্য করা। আমাদের "নিজস্ব-দেশজ" "দারিদ্র নির্মূল/বিমোচন কৌশল দলিল" প্রণয়ন এ জন্যও দরকার যে সরকারের তথাকথিত "দারিদ্র হ্রাস কৌশলপত্র" রচিত হয়েছে বিশ্ব ব্যাংক ও আই এম এফ-এর কনসেশনাল ঋণ পাবার পূর্ব শর্ত হিসেবে যা এ দেশের "মাটি থেকে উত্থিত নয়" (home grown)। এদেশের দরিদ্র মানুষের নিজস্ব "দারিদ্র বিমোচন কৌশল দলিল" প্রণয়ন কোনো জোর জবরদস্তির বিষয় নয়– দরিদ্র মানুষের অধিকার নিশ্চিত করার কৌশল হিসেবেই তা ভাবতে হবে।

দারিদ্র বিমোচন লক্ষ্যে 'উন্নয়ন'-এর রূপরেখা কেমন হবে বিষয়টি এখনও পর্যন্ত আমাদের অজানা। শুধু দারিদ্রের মর্মবস্তুর নিরিখেই নয়, দারিদ্র-বিমোচন লক্ষ্যের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড কেমন হতে পারে, এ বিষয়েও আমাদের জ্ঞানের ভিত্তি যথেষ্ট মাত্রায় দুর্বল বলে আমি মনে করি। দারিদ্র বিষয়ক কোনো দেশজ জ্ঞানতত্ত্বের অস্তিত্ব এ দেশে আছে কি'না, সে বিষয়েও আমি সন্দিহান।

দারিদ্রের উৎস—আত্মঘাতি লুণ্ঠন সংস্কৃতি যা বৈষম্য উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন করে

এ বিষয়ে দ্বিমত নেই যে দারিদ্রের বিস্তৃতি ও মাত্রা এখন যা এবং যে দিকে এগুচ্ছে, প্রবণতার চাকাটি তার উল্টো দিকে আনতে হবে। আর সেটাই হবে আমাদের সংবিধানের প্রতি বিশ্বস্ততা প্রকাশের সর্বোৎকৃষ্ট মানদণ্ড। স্বাধীনতার পরে গত তিন দশকে আমাদের দেশে উত্তরোত্তর অধিক হারে দারিদ্রের উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন হয়েছে । দারিদ্রের উৎস-বৈষম্যের বিকাশ হয়েছে অবারিত। বৈষম্য সৃষ্টির উৎসসমূহে কি অর্থনীতি, কি রাজনীতি, কি শিক্ষা-সংস্কৃতি— সর্বত্র এক আত্মঘাতি লুণ্ঠন সংস্কৃতি জেঁকে বসেছে। এই লুণ্ঠন সংস্কৃতির চরিত্র-নিয়ামক হ'ল কালো টাকা, সন্ত্রাস, পেশি-শক্তি, ঘুষ, দুর্নীতি, কুশাসন-অপশাসন, দমন-নিপীড়ন ইত্যাদি। পুঁজিবাদ বিকাশে লুণ্ঠন নিয়ামক ভূমিকা পালন করে কিন্তু এদেশে আত্মঘাতি লুণ্ঠন প্রক্রিয়া জাতীয় পুঁজি বিকাশে ব্যর্থ হয়েছে (তা না হলে বিশ্বের সর্ববৃহৎ পাটকল আদমজি বন্ধ হবে কেন?)। স্বাধীনতাত্তোর অর্থনীতির হরিলুট, বৈষম্য বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন করেছে। বাংলাদেশের অর্থনীতি যে "দুর্বৃত্তায়নের ফাঁদে" পড়েছে এবং তা থেকে দারিদ্র পুনরুৎপাদিত হচ্ছে এ অবস্থার পরিবর্তন ছাড়া দারিদ্র বিমোচিত হবে না। বিষয়টি নিম্নরূপ :

- অর্থনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের ফাঁদ রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের কার্যকরী চাহিদা বৃদ্ধি করছে; আর ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন অর্থনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের ফাঁদকে উত্তরোত্তর শক্তিশালী করছে।

- গত তিন দশকে সরকারিভাবে যে প্রায় ২ লাখ কোটি টাকার বৈদেশিক ঋণ-সাহায্য এসেছে, তার ৭৫% লুন্ঠন করেছে অর্থনীতি–রাজনীতির দুর্বৃত্ত গোষ্ঠি। ফলে ক্ষমতাধররা অধিকতর ক্ষমতাবান হয়েছেন আর ক্ষমতাহীন দরিদ্রের অক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

- ক্ষমতাবানেরা এক ধরনের নিকৃষ্ট পুঁজির (ব্রিফকেস পুঁজি বা কমিশন/দালাল পুঁজি) মালিক হয়েছেন। এ পুঁজি অনুৎপাদনশীল। উৎপাদনশীল বিনিয়োগে এর কোনোই আগ্রহ নেই।

- ক্ষমতাবানেরা এখন কালো অর্থনীতির একটা বলয় সৃষ্টি করেছেন, যে দুষ্টচক্রে বছরে এখন ৭০-৭৫ হাজার কোটি কালো টাকার সৃষ্টি হয়, যা জাতীয় আয়ের এক-তৃতীয়াংশ। এ বলয়ে যাদের অবস্থান, তারাই আবার ৩০ হাজার কোটি টাকার ঋণখেলাপি (লুন্ঠন সংস্কৃতিতে যুক্ত হয়েছে ঋণখেলাপি সংস্কৃতি)। এরাই বছরে ১৫ হাজার কোটি টাকার ঘুষ-দুর্নীতিতে জড়িত। এরাই বছরে কমপক্ষে ৩০ হাজার কোটি টাকার সমপরিমাণ মুদ্রা পাচার করছেন; এরাই অর্থনীতি, সমাজ ও রাষ্ট্রে এক ধরণের স্থবিরতা সৃষ্টি করেছেন যেখানে দারিদ্র বিমোচন অসম্ভব। এরাই আবার রাষ্ট্রক্ষমতায় থেকে এবং/অথবা তাকে ব্যবহার করে দারিদ্র বিমোচন কর্মকাণ্ড দুরূহ করছেন।

- দুর্বৃত্ত-বেষ্টিত সরকার তার বিনিয়োগ সিদ্ধান্তে যত না মানুষকে গুরুত্ব দিচ্ছে, তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব দিতে বাধ্য লুন্ঠনের খাতকে। যে পরিমাণ অর্থ-সম্পদ বিনিয়োগ করে বাংলাদেশকে সম্পূর্ণরূপে যক্ষ্মা ও কুষ্ঠরোগ মুক্ত করা সম্ভব, তার সমপরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়েছে যুদ্ধ বিমান কিনতে। বাজেট ঘাটতি হবে অথচ অনুৎপাদনশীল ব্যয় উদ্বৃত্ত হবে। এ ধরনের বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত আর যাই হোক দারিদ্র বিমোচন উদ্দিষ্ট নয়। এরাই আবার প্রাক-নির্বাচনী জাতীয় বাজেটে অসৎ উদ্দেশ্যে ৬,০০০ কোটি টাকা থোক বরাদ্দ করছেন।

- ক্ষমতাবান দুর্বৃত্তদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য একটি রাজনৈতিক সংস্কৃতিও গড়ে উঠেছে যা উত্তরোত্তর সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও মূল্যবোধ সংশ্লিষ্ট দারিদ্র বৃদ্ধি করছে (যার সবগুলি সংবিধানের ১১, ২৬-২৯, ৩১-৩২, ৩৫-৪১, ৪৩-৪৬ অনুচ্ছেদসমূহের পরিপন্থী): যেখানে নির্বাচন মানেই কালোটাকার প্রতিযোগিতা (গত জাতীয় নির্বাচনে নির্বাচন-সংশ্লিষ্ট ব্যয় প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা যেখানে সন্ত্রাস-সহিংসতা অনিবার্য ও নৈমিত্তিক বিষয়; যেখানে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অবমাননা সাধারণ নিয়ম; যেখানে সরকারি গণমাধ্যম মানেই স্তুতি প্রচারের যন্ত্র; যেখানে মানব-মুখী সকল মাধ্যম (গণমাধ্যমসহ) দ্রুত বন্ধ করা হয়; যেখানে জনগণের অংশগ্রহণ বিষয়টি নেহায়েতই টোকেনইজম (স্লোগান); যেখানে সুশাসন বিষয়টি অতিমাত্রায় উচ্চারিত কিন্তু প্রকৃতই মূল্যহীন; যেখানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নেহায়েতই কাগুজে; যেখানে মানুষের দুর্দশা-বঞ্চনাকেন্দ্রিক ব্যবসা সবচে' লাভজনক; যেখানে রাষ্ট্রক্ষমতার পরিচালকেরা বলতে বাধ্য হন যে, রাষ্ট্র পর্যন্ত সন্ত্রাসে মদদ দিতে বাধ্য, ইত্যাদি।

সুতরাং একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, একটি আত্মঘাতি লুন্ঠন প্রক্রিয়া অর্থনীতি-রাজনীতি-সমাজকে দুর্বৃত্তায়িত করার মাধ্যমে সকল ধরনের বৈষম্য সৃষ্টির ভিত্তি সুদৃঢ় করেছে যা দারিদ্র সৃষ্টিতে পালন করছে কেন্দ্রিয় ভূমিকা। এহেন অবস্থায় দারিদ্র হ্রাস (উচ্ছেদের কথা আপাতত ভুললেও চলবে) আদৌ সম্ভব কি?

আমাদের দেশে দারিদ্রের নতুন মাত্রা সম্পর্কে খুব কমই ভাবা হয়

দারিদ্রের নূতন মাত্রা যেমন যুব ও প্রবীণ-দারিদ্র নিয়ে খুব একটা ভাবা হয় না। যুবকদের বিশাল অংশ বেকার। আর যুব-বেকারত্ব সৃষ্টি করছে বিশাল এক বাহিনী যা ব্যবহার করছেন কালোটাকার মালিক ও রাজনীতিবিদরা। যুবদারিদ্র উদ্ভূত নিরাশা সৃষ্টি করছে বিভিন্ন ধরনের নবতর পারিপার্শ্বিক ও সামাজিক অস্থিরতা। যুবদারিদ্র নিয়ে বাণিজ্য এখন অনেকের জন্য বেশ লাভজনক। দারিদ্রের নতুন মাত্রা সৃষ্টি হয়েছে প্রবীণ জনগোষ্ঠির মধ্যেও। একদিকে আয়ুস্কাল বৃদ্ধি ও যৌথ পরিবার ভেঙ্গে যাওয়া (অধিকহারে একক পরিবার সৃষ্টি) আর অন্যদিকে প্রবীণদের জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের অনিশ্চয়তার ফলে ক্রমবর্ধমান হারে সৃষ্টি হচ্ছে বয়স্ক-দারিদ্র। আমাদের দারিদ্রাবস্থা নিরূপণে দারিদ্রের এ দু'টি নতুন রূপ (যুবদারিদ্র ও বয়স্ক দারিদ্র)—নিশ্চিতভাবেই উপেক্ষিত। এসব নিয়ে হয়ত বা দু'একটি প্রকল্প নেয়া হয়েছে, ভবিষ্যতে হয়ত বা আরও প্রকল্প হাতে নেয়া হবে। আবারও আমরা প্রস্তর যুগে অনুপ্রবেশ করবো কারণ আরও কয়েকটি প্রকল্পের প্রস্তর ফলক উম্মোচিত হবে। অবস্থা হবে অনেকটা "Animal Farm"-এর মত। কিন্তু যুব ও বয়স্ক-দারিদ্র সৃষ্টির উৎসে হাত দেয়া হবে না।

"সংগঠিত মূল্য সন্ত্রাসী সিন্ডিকেট" ও দারিদ্র পুনরুৎপাদন

এদেশে সংগঠিত মূল্য সন্ত্রাসী সিন্ডিকেট দারিদ্র পুনরুৎপাদনে এখন জোর ভূমিকা রাখছে। প্রকৃত বাজারের তথ্যের ভিত্তিতে (অর্থাৎ যে দামে মানুষ দ্রব্য/পণ্য কেনেন– খাদ্য ও খাদ্য বহির্ভূত উভয়ই) "সংগঠিত মূল্য সন্ত্রাসী সিন্ডিকেট" যে পরিমাণ অর্থ লুট করেছে তা সম্পর্কে আমার হিসেবটি নিম্নরূপ: "সংগঠিত মূল্য সন্ত্রাসী সিন্ডিকেট"– নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য কৃত্রিমভাবে (artificially) বাড়িয়ে গত প্রায় ৫ বছরে এ দেশের জনগণের কাছ থেকে মোট ২৮৬,১১০ কোটি টাকা লুট করেছে। মোট লুটের মধ্যে ১৯৩,৮১৭ কোটি টাকা (৬৮%) লুট করেছে খাদ্য-খাতে আর বাদ বাকী ৯২,২৯৩ কোটি টাকা (৩২%) লুট করেছে খাদ্য-বহির্ভূত খাতে। কয়েকটি প্রধান খাতওয়ারি লুটের পরিমাণ: চালে ৭৭,৩৮৫ কোটি টাকা, ডালে ৮,৭৬০ কোটি টাকা, সয়াবিন তেলে ২,৫৫৩ কোটি টাকা, চিনিতে ৩,৪৪৭ কোটি টাকা, পেঁয়াজে ৩,৭৭৬ কোটি টাকা, মরিচে ৬,৫৫১ কোটি টাকা, বিভিন্ন ধরনের শাক-শবজি-ফলমূলে ৩৩,৩৩৪ কোটি টাকা, কেরোসিনে ৩,৫৪১ কোটি টাকা, ঘর ভাড়ায় (গ্যাস-বিদ্যুৎ-পানিসহ) ৪৫,৬৮০ কোটি টাকা, যাতায়াত-পরিবহনে ১৪,৭৬৬ কোটি টাকা, স্বাস্থ্য-চিকিৎসা ব্যয়ে ৪,২৬০ কোটি টাকা, শিক্ষায় ৮,৪০৬ কোটি টাকা। মোট লুটের ৭২% হয়েছে গ্রামে আর ২৮% হয়েছে শহরে। এ লুটের শিকার হয়েছেন ১ কোটি ৮২ লাখ দরিদ্র পরিবার (৯ কোটি ১০ লাখ মানুষ), ৪৮ লাখ নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার (২ কোটি ৪০ লাখ মানুষ), আর ৩০ লাখ মধ্য-মধ্যবিত্ত পরিবার (১ কোটি ৫০ লাখ মানুষ)।

সারণি ৩: গত পাঁচ বছরে (২০০১-২০০৬) মূল্য সন্ত্রাসের ফলে জনগণকে অতিরিক্ত যা ব্যয় করতে হয়েছে

পরিবারের ধরন	পরিবারের সংখ্যা (কোটি)	জীবনযাত্রার অতিরিক্ত ব্যয় (কোটি টাকায়) (গত প্রায় ৫ বছরে)
দরিদ্র	১.৮২	১৭৭,৯৫৪
নিম্ন-মধ্যবিত্ত	০.৪৮	৫৬,৯৮১
মধ্য-মধ্যবিত্ত	০.৩০	৫১,১৭৫
মোট	২.৬ (মোট মানুষ ১৩ কোটি)	২৮৬,১১০

গত প্রায় পাঁচ বছরে ১৪ কোটি মানুষের বাংলাদেশে ১৩ কোটি মানুষ (দরিদ্র, নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও মধ্য-মধ্যবিত্ত) চরমভাবে লুটের শিকার হয়েছেন। 'মূল্য সন্ত্রাসের' কারণে দরিদ্র মানুষকে পরিবার চালাতে গিয়ে হয় খাদ্যভোগ কমাতে হয়েছে, অথবা পুষ্টিহীন হতে হয়েছে, অথবা খাদ্য-বহির্ভূত খাতে (বিশেষ করে স্বাস্থ্য-চিকিৎসা ও শিক্ষায়) ব্যয় কমাতে হয়েছে, অথবা অতীতের সঞ্চয় ভেঙ্গে ফেলতে হয়েছে, অথবা দুর্দশাগ্রস্ততার কারণে সম্পদ (যাই ছিল) বেচতে হয়েছে– অর্থাৎ গত ৫ বছরে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য মূল্যের উর্ধ্বগতির কারণে দরিদ্র মানুষ নিঃস্ব হয়ে ভিক্ষুকে রূপান্তরিত হয়েছেন। অনেকটাই অনুরূপ অবস্থা হয়েছে নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারে। আর মধ্য-মধ্যবিত্ত পরিবার– যাদের অনেকেই শিক্ষিত কিন্তু বেকার–এর অবস্থা দ্রুত অধোগতির দিকে নেমে গেছে। অতএব, 'মূল্য সন্ত্রাসের' এ প্রক্রিয়ায় ১৩ কোটি মানুষের (দেশের ৯৪% মানুষ) দারিদ্র-দুর্দশা-অসহায়ত্ব বেড়েছে: দরিদ্র হয়েছে দরিদ্রতর; নিম্ন-মধ্যবিত্ত মানুষের একাংশ দরিদ্র মানুষের দলে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছেন; আর মধ্য-মধ্যবিত্ত মানুষের একাংশ অবশ্যই নিম্ন-মধ্যবিত্তের দলে যেতে বাধ্য হয়েছেন। এ অবস্থায় দারিদ্র হ্রাসের সরকারি কথার মারপ্যাচ– বুদ্ধিবৃত্তিক জালিয়াতি মাত্র।

তথ্য ভিত্তিক আমার হিসেব এ দেশে দুর্বৃত্তায়ন-দুর্নীতি-সন্ত্রাসতত্ত্বকে আরো শক্তিশালী করে – এ বিষয়ে কারো দ্বিধা থাকার কথা নয়। আর অন্যদিকে লুটের এসব হিসেবপত্তর এও নির্দেশ করে যে ওরা প্রচুর কালোটাকার মালিক হয়েছে যার একাংশ তারা অবশ্যই আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ব্যয় করে জিততে চাইবে। আবার এ কথাও সত্য যে এত লুট যারা করলো– ভবিষ্যতে তারা কি হাত গুটিয়ে বসে থাকবে?

সংগঠিত সিন্ডিকেটের এসব মূল্য সন্ত্রাসীরা বৃহৎ পর্দার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের ঘনিষ্ঠ সহচর মাত্র। সংগঠিত সিন্ডিকেটভিত্তিক এসব মূল্য সন্ত্রাসীরা শুধু চালের মূল্য নিয়েই সন্ত্রাস করে না, এ সন্ত্রাস পিঁয়াজ-রসুন-ডাল-তেল-গুড়োদুধ-বাস ভাড়া-গ্যাস-পানি-বিদ্যুৎ-সার-বীজ হয়ে রাজনৈতিক অঙ্গন পর্যন্ত বিস্তৃত, যার প্রধান শিকার নিঃসন্দেহে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র-নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্ত মানুষ। এ ছাড়াও ভুললে চলবে না যে ইদানিং মৌলবাদী জঙ্গীত্ব যে 'আত্মঘাতি বোমা সংস্কৃতি' চালু করেছে তা জীবনের নিরাপত্তা হ্রাসসহ মজুতদারি-কালোবাজারি বৃদ্ধির মাধ্যমে জনজীবন অধিকতর দুর্বিষহ করছে। নূতন এ অবস্থাটা মূল্য সন্ত্রাস বৃদ্ধির সহায়ক যা দারিদ্র বাড়ায়। সুতরাং মূল্য সন্ত্রাসের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ভিত্তি যতদিন থাকবে ততোদিন দ্রব্যমূল্য বাড়বে এবং দারিদ্র বাড়বে– এ বিষয়ে সন্দেহের যৌক্তিক কোনো কারণ নেই। একদিকে অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন-সৃষ্ট মূল্য সন্ত্রাস আর অন্যদিকে মৌলবাদী জঙ্গীত্বের কারণে মূল্য সন্ত্রাস বৃদ্ধি– দারিদ্র পুনরুৎপাদনের এসব সমীকরণ নিয়ে নূতন করে ভাবতে হবে।

"দুর্নীতি দারিদ্র বাড়ায়" আর "বাংলাদেশ বিশ্বের সবচে' দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ"– ঠিক কি?

কিন্তু এসব বলে দারিদ্রের মূল কারণে না গিয়ে দুর্নীতিকে দারিদ্রের প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করার (অপ)প্রয়াস আছে। এক্ষেত্রে জনগণের অর্থনীতিবিদ হিসেবে একটা প্রশ্ন সরাসরি উত্থাপন জরুরি– তা হলো দুর্নীতি কে বা কারা করেন, কোন গোষ্ঠি করেন? দেশে বছরে যে ৭০-৭৫ হাজার কোটি টাকার সমপরিমাণ কালো টাকা সৃষ্টি হয় তাতে দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠির মানুষের আদৌ কোনো ভাগ আছে কি? দরিদ্র মানুষ কি দুর্নীতি করেন? যদি না করেন তাহলে কারা করেন তা উচ্চকণ্ঠে জানান দেয়া দরকার। আর এ কথাটি এখন বলা যেতে পারে যে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব দুর্নীতিবাজ শ্রেণী-গোষ্ঠির হাত থেকে কখনো দুর্নীতি করেনি অর্থাৎ শ্রমজীবী-দরিদ্র মানুষের হাতে ছেড়ে দিলেই তো দুর্নীতি উদ্ভূত দারিদ্র সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। উচ্চস্বরে এ কথা বলতে অসুবিধা কোথায়? না'কি এ বক্তব্য কল্পকথা (ইউটোপিয়া)?

দারিদ্র বিমোচনে বিশ্বায়নের সম্ভাব্য ভূমিকা কি হতে পারে?

দারিদ্র দূরীকরণে আঞ্চলিক সহযোগিতাসহ বিশ্বায়ন নিয়ে এখন অনেক কথা হচ্ছে। "দরিদ্রদের কল্যাণ নিশ্চিত করতে ইচ্ছুক"(!)– এমন অনেক সংগঠনের নেতৃবৃন্দের অনেকেই এখন এসব নিয়ে দাতাদের পয়সায় বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার সভা-সম্মেলনে দেশ-বিদেশ যাচ্ছেন। দেশের দরিদ্র মানুষদের স্বার্থ উদ্ধারে দেশের ভিতরে কাজের চেয়ে বিদেশমুখীতা ইদানিং বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। এসব করে কি লাভ/কার লাভ– বিষয়টি বেশ দুর্বোধ্য; তবে আমি জানি "বাজার দরিদ্র বান্ধব নয়"। অবাধ বাজারভিত্তিক বিশ্বায়নের যুগে (যেখানে অসম প্রতিযোগিতা মুখ্য বিষয়) প্রায়শই শুনি যে আমাদের দেশের শ্রমজীবী মানুষকে অবাধে অন্যদেশে শ্রমশক্তি বিক্রির সুযোগ দিলে এ দেশের দারিদ্র দূর হয়ে যাবে। আপাত দৃষ্টিতে যুক্তির কথা বলেই মনে হয়। কিন্তু যখন দেখি প্রত্যন্ত গ্রামের নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্ত পরিবারের তরতাজা একজন যুবক যখন জমি-জমা-সম্পদ-সম্পত্তি বিক্রি করে ২ লাখ টাকা ব্যয় করে ২ বছরের চুক্তিতে মধ্যপ্রাচ্যে গিয়ে রাত-দিন পরিশ্রম করে ২ বছরে মোট ২ লাখ টাকা আয় করেন তখন দারিদ্র দূর হল কোথায়? আসলে এসব করে যা হলো তাকে এভাবে বলা চলে "আমাদের ঐ যুবকটি মধ্যপ্রাচ্যে ২ লাখ টাকার সমপরিমাণ বিনিয়োগ করলো যার রিটার্ন শূন্য অথবা নেগেটিভ" অর্থাৎ "মধ্যপ্রাচ্যে আমরা ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট করলাম যার নেট রিটার্ন পাচ্ছে মধ্যপ্রাচ্য"। এ তো সম্পদ হাত ছাড়া হবার এক নূতন পদ্ধতি মাত্র। সুতরাং দারিদ্র বিমোচনের পদ্ধতি হিসেবে বিদেশে শ্রমশক্তি বিক্রির ক্ষেত্রে আমাদের নূতনভাবে ভাবতে হবে। সরকার তো এসব নিয়ে ভাববেন না কারণ তারা এমনি এমনিই বছরে প্রায় ৪ বিলিয়ন ডলার পাচ্ছেন (যা একক খাত থেকে সরকারের সর্বোচ্চ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন)। সংশ্লিষ্ট এ বিষয়ে আমরা কি এ বিবেচনা মাথায় রাখতে পারি যে এখন থেকে ২০ বছর পরে ইউরোপে ২ কোটি বিদেশি শ্রমশক্তি দরকার হবে; স্বদেশের উন্নয়নের জন্য মানবশক্তি পরিকল্পনা জরুরি; প্রশিক্ষিত শ্রমশক্তি পরিকল্পিতভাবে বিদেশে পাঠালে অনেক গুণ বেশি লাভ হতে পারে; আর দাতাদের অর্থে বিশ্ববাণিজ্যকেন্দ্রিক সভা-সমিতিতে বিদেশ না গেলে কি ক্ষতি(?)।

দারিদ্রহ্রাস কৌশলের দারিদ্র; ধনী নিয়ে গবেষণা জরুরি

গ্রাম-শহর নির্বিশেষে আবাসনের দারিদ্র বেড়েই চলেছে। বাংলাদেশে প্রায় ১ কোটি পরিবারের (অর্থাৎ ৫ কোটি মানুষের) নিজ মালিকানাধীন মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই। এরা বাস করেন শহরের বস্তিতে (অনেকেই ভাসমান), শিল্প এলাকায়, চরাঞ্চলে, গ্রামে, শহরতলীতে ইত্যাদি। এসব মানুষের আবাসনের দারিদ্র যথাসম্ভব দ্রুত দূর করার জন্য কে সোচ্চার হবে? কে নেবে কার্যকরী পদক্ষেপ? এ বিষয়ে আমরা উচ্চকণ্ঠ হতে পারি না কি?

দরিদ্র মানুষের সন্তানেরা যে স্কুলে যেতে পারে না অথবা স্কুলে গেলেও কপালে জোটে অতি নিুমানের শিক্ষা অথবা শিক্ষা শেষের আগেই স্কুল পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়– এ দারিদ্রের কি হবে? শিক্ষা তো সাংবিধানিকভাবেই মানব-অধিকার– মানুষ তো জন্মসূত্রে এ অধিকার পায়। কিন্তু এতো ঢাক-ঢোল পেটানোর পরে সরকারই যখন বলছে যে বাংলাদেশে এখন প্রায় সবাই স্কুলে যায় তখন দরিদ্র পরিবারের সন্তান-সন্ততিদের কয়জন উচ্চশিক্ষা পেয়েছেন? অবস্থা যা তাতে এভাবে সরাসরি এ প্রশ্ন করাটা অনেকেই আমার আদবের অভাব মনে করতে পারেন। কিন্তু কথাটা তো সত্য।

শ্রমজীবী-দরিদ্র পরিবারের কোনো একজন সদস্য-সদস্যার যদি এমন কোনো অসুখ হয় যখন অপারেশন করা এবং/অথবা ঔষধ কিনতে অনেক অর্থের প্রয়োজন তখন আসলে অবস্থাটা কি হয়? প্রথমেই যা করতে হয় তা হলো পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ এবং/অথবা সারা জীবনের সঞ্চিত সম্পদ (যদি থেকে থাকে) এক নিমেষে বিক্রি করতে হয় (যাকে অর্থনীতিবিদরা বলেন "দুর্দশাগ্রস্ততার কারণে সম্পদ বিক্রি")। আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবদের কাছে ধার-দেনা করতে হয়। এ হচেছ অনেকটা "নদী ভাঙ্গনে– এক রাতে সব কিছু নদীগর্ভে চলে যাবার মত"। এরপর ঐ মেহনতী মানুষটির কাজ থাকলেই কি না থাকলেই কি। "স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি" যদি

মানুষের সাংবিধানিক অধিকারই হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে সংবিধানের এ বাধ্যবাধকতার বাস্তবায়নে সরকার কি করছে/করে? ব্যাপারটি কি এ রকম যে যতোদিন কালো টাকার মালিকেরা আমাদের প্রতিনিধিত্ব করবে ততোদিন এসবে কার্যকরী তেমন কিছু হবে না। তাহলে তথাকথিত উন্নয়ন কৌশল, দারিদ্র হ্রাস কৌশল, আর ৫-৬% অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দিয়ে কি হবে? আমার মনে হয় আমাদের নির্মোহভাবে জানা প্রয়োজন এদেশের মানুষ কেন ভিক্ষুক হয় (?); মানুষ কেন নি:স্ব হয় (?); মানুষ কেন রিক্সা-ভ্যান-ঠেলাগাড়ী চালায় (?); শিশুরা কেন কাউরান বাজারে টুকরির মধ্যে ঘুমায়?; মহিলারা কেন ইট ভাঙ্গে (?) ইত্যাদি। গবেষণায় প্রমাণিত যে সখ করে কেউই ভিক্ষুক হয় না– আজকের পুরুষ ভিক্ষুকটি প্রথমে ছিলেন গ্রামের কৃষক অথবা আদমজীর শ্রমিক, তারপর চালিয়েছেন রিক্সা, তারপরে হয়েছেন অসুস্থ, আর তারপরেই ভিক্ষুক, আর এখন অসুখ বেড়ে তিনি অকাল মুত্যুর দিকে এগুচ্ছেন; আর আজকের মহিলা ভিক্ষুকটি হয় ঐ পুরুষ ভিক্ষুকের স্ত্রী অথবা গ্রাম থেকে আসা নিঃস্ব একজন মানুষ যিনি ঝি-এর কাজ করেছেন, তারপর এক পর্যায়ে অসুস্থ হয়ে ভিক্ষাবৃত্তি শুরু করেছেন, আর এখন অসুস্থতা বেড়ে মৃত্যুর প্রহর গুণছেন। এসব অকাল মৃত্যুর দায় দায়িত্ব কার? এসব মানুষ নিয়ে "দারিদ্র হ্রাস কৌশল" কি কিছু ভাবছে? আসলে ভাবছে না। সম্ভবত ক্রমবর্ধমান দুর্বৃত্তায়নের কাঠামোতে ভাববারও কথা নয়। "দারিদ্র হ্রাস কৌশলেরই" এ এক মহা দারিদ্র। আমার মনে হয় কিছু মানুষ কেন, কিভাবে, কোন প্রক্রিয়ায় অঢেল সম্পদের মালিক হন– তা জানলে দারিদ্রের কারণও অনেক দূর জানা যাবে। আসলে দারিদ্র নিয়ে যারা সত্যিকার অর্থে চিন্তা ভাবনা-গবেষণা করছেন তাদের এখন 'ধনী' নিয়ে গবেষণা করা প্রয়োজন।

দারিদ্র বিমোচন ওহ্রাস সন্দেহাতিতভাবে এক রাজনৈতিক সদিচ্ছা, প্রতিশ্রুতি ও যোগ্যতার প্রশ্ন

রাজনীতিতে নির্ধারক হবে কালোটাকা আর কালোটাকার মালিকরা–আর সরকারে গিয়ে তারা দারিদ্র দূরীকরণ করবে — এ বিশ্বাসের যুক্তি কোথায়? আর সে কারণেই প্রচলিত রাজনীতিবিদরা সরকারে ও সরকারের বাইরে দারিদ্র নিয়ে ব্যবসা করবেন — যা তারা করছেন। এটাই স্বাভাবিক। দারিদ্র দূরীকরণের জন্য হাজারো চুক্তিভিত্তিক প্রকল্প গৃহীত হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হবে; কিন্তু কখনও, কোনো অবস্থাতেই এমন কর্মসূচি নেয়া হবে না, যেখানে বাজেটের প্রধান অংশ বরাদ্দ করে প্রকৃত দারিদ্রের সকল নির্দেশক (indicator অর্থে) ভিত্তিক সময় বেঁধে দিয়ে কর্মকাণ্ড সংবিধানের নির্দেশ মোতাবেক পরিচালিত হবে, ব্যর্থতার শাস্তি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে এবং শাস্তির বিধান কার্যকরী করা হবে। এগুলো হবে না, কারণ সে ক্ষেত্রে লুন্ঠন প্রক্রিয়া ও বৈষম্য সৃষ্টির সব পথ-ঘাট বন্ধ হয়ে যাবে। বসের চেয়ারের পিছনে যতদিন তোয়ালে থাকবে ততদিন ঔপনিবেশিক মানসিকতাও যাবে না, আর সেটা অটুট থাকলে দারিদ্র প্রকল্প লাভজনক ব্যবসা হিসেবেই চিরকাল বহাল থাকবে। চেয়ারের মানুষটির দারিদ্র কিভাবে দূর হবে? দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ফ্লাটের মালিক না হতে পারার দারিদ্র কি ভাবে দূর হবে? আমার মাটির তলায়-উপরের সম্পদ অন্যের হাতে নির্বিঘ্নে হস্তান্তর করতে না পারার দারিদ্র কিভাবে দূর হবে?

ছোট মনে বড় কাজ করা সম্ভব নয়; আর আমরা যারা কালোটাকার প্রভুদের মধ্যবিত্ত ভক্ত, তারা মনের দিক থেকে যথেষ্ট মাত্রায় অনাবাসি। আমরা যত না ইহকালে বাস করি, ততধিক পরকালে। আর ইহকালে পশ্চিমা পাসপোর্ট প্রাপ্তির মুর্খতা আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছায় জেঁকে বসেছে। গোলকায়নের গোলকধাঁধায় আমি তো বিশ্বনাগরিক (তৃতীয় শ্রেণীর হলেও)– আমার দেশপ্রেম থেকে বিশ্বপ্রেম জরুরি। সুতরাং, সম্ভবত আরও একবার ভাল করে ভাবতে হবে। ভাবনাকে জাতীয় চিন্তায় রূপ দিতে হবে। দুর্বৃত্তবেষ্টিত যে সমাজ-অর্থনীতি আমরা সৃষ্টি করেছি, সে কাঠামোতে আদৌ দারিদ্র বিমোচন সম্ভব কি'না, ভেবে দেখতে হবে। ভাবতে হবে এ বিষয়ে রাজনৈতিক ঐকমত্যের প্রসঙ্গটি; গভীরভাবে ভাবতে হবে মধ্যবিত্তের মানসিক-কাঠামোর রূপান্তরের প্রয়োজনীয়তা। "বাজার দরিদ্র-বান্ধব নয়"। সেই সঙ্গে বিশ্বায়নের তোড়ে মুক্তবাজার ততোধিক দরিদ্র-বিরোধি। ভাবতে হবে, নিজের পায়ের তলায় মাটি শক্তিশালী করার কৌশল নিয়ে। যার ফলে যত দ্রুত সম্ভব দারিদ্র উচ্ছেদ হবে।

পৃথিবীর কোথাও বিদেশি পরামর্শ ও ঋণে দারিদ্র বিমোচিত হয়েছে কি?

এদেশের গ্রামে জন্মে এদেশের মাটিতে মানুষ হয়ে আমাদের দারিদ্রের প্রকৃতি ও দরিদ্র মানুষের চেহারা আমরাই যদি না বুঝি তাহলে বিশ্বব্যাংকের ভিনদেশি সাহেবরা তা কিভাবে আমাদের চেয়ে ভাল বুঝবেন? এটা আমার কাছে একদিকে যেমন দুর্বোধ্য, অন্যদিকে অত্যন্ত অপমানজনক। শুনেছি আমাদের দারিদ্র হ্রাস কৌশলপত্র (PRSP) বিশ্বব্যাংকের নির্দেশ মোতাবেক রচিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে দারিদ্র-চিন্তা সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি হতে পারে: আমি এতক্ষণ যা কিছু বলেছি তার কোনো কিছুই PRSP-তে নেই; PRSP-র কোথাও দরিদ্রের বিপরীতে ধনী শব্দটি ব্যবহৃত হয়নি। কেন? PRSP-তে ভূমিহীনদের নিয়ে তৃণমূল পর্যায়ে পরামর্শ করা grassroot consultation হয়েছে; অথচ ভূমিহীনদের একজনও জমির মালিকানা চাইলো না – এটা কি বিশ্বাসযোগ্য? সম্পদের মালিকানা, বণ্টন- অসাম্য, কৃষি সংস্কার, ভূমি-জলা সংস্কার – এসব বিষয়ে কেউই কিছু বলেননি – বিষয়টি শুধু সন্দেহজনকই নয়, সম্ভবত পূর্ব-নির্ধারিত; PRSP-র (grassroot consultation) করে তো কালোটাকা ও কালো অর্থনীতির বিস্তৃতি সংক্রান্ত হিসেবপত্তর ও কমিশন-দালালির অর্থনীতি বোঝা যাবে না। এ ক্ষেত্রে PRSP-তে ব্যবহৃত পদ্ধতিসমূহ (Methodology) যথেষ্ট মাত্রায় দুর্বল। আর সচেতনভাবে দুর্বল করা হয়ে থাকলে তা অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত। PRSP-র দারিদ্র হ্রাস কৌশলে প্রথমেই বলা হচ্ছে "all routes matter" – অনেকটা everybody's responsibility-র মতো যেটা আসলে nobody's responsibility। তারপরে বলা হচ্ছে "minimizing the severity of poverty" অর্থাৎ দারিদ্রে অসুবিধে নেই, অসহনীয় দারিদ্র হ্রাস করতে হবে। আর কৌশল হিসেবে যা বলা হচ্ছে তা অনেকটা কুকুরের লেজ টেনে সোজা করার মত।

দারিদ্র উচ্ছেদ তাহলে কিভাবে হবে?

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আন্তরিক ইচ্ছা থাকলে আমরা আমাদের সংবিধান মেনে দারিদ্র উচ্ছেদ ও হ্রাসে দেশোপযোগী নীতি ও কৌশল বিনির্মাণ এবং তা বাস্তবায়ন করতে সক্ষম। সেই সঙ্গে আমি এও মনে করি যে, বিশ্ব ব্যাংকের ঋণ গ্রহণের পূর্বশর্ত হিসেবে প্রণীত তথাকথিত দারিদ্র হ্রাসের কৌশলপত্র (নামকরণটি বেশ নিরপেক্ষ গোছের কিন্তু ষড়যন্ত্রমূলক) আমাদের সার্বভৌমত্বের প্রতি একধরনের অস্বীকৃতি। আমার জানামতে আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন বেশ কিছু দেশ ইতোমধ্যে বিশ্বব্যাংকের পরামর্শে দারিদ্র হ্রাস কৌশলপত্র প্রণয়নে অস্বীকার করেছে। কেউ বলেছে, তাদের সংবিধান আছে এবং তার বিধানের ভিত্তিতে দারিদ্র দূরীকরণ হচ্ছে/হবে; কেউ বলেছে, সংবিধান মেনে যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা করা হচ্ছে, সেটাই তাদের উন্নয়ন কৌশল। আমরা কেন পারছি না?

আমি মনে করি, জনগণের স্বার্থ সবকিছুর উর্ধ্বে। আর দারিদ্রসহ জনগণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি বলতে আমরা কি বুঝবো এবং সেগুলো রাষ্ট্র ও সরকার কিভাবে নিশ্চিত করবে তা তো সংবিধানেই আছে। মানুষ হিসাবে দরিদ্র মানুষ সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতার সমঅংশীদার। আমাদের সংবিধান তেত্রিশ বছর আগে মানুষের জন্য যে স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছে, সেটা বাস্তবায়িত হলে দারিদ্র নিয়ে সেমিনার সিম্পোজিয়াম-এর প্রয়োজন নেই। মনে রাখা জরুরি যে এ দেশের দারিদ্র প্রধানত মনুষ্যসৃষ্ট–ভূমিকম্প বা অলৌকিক কোনো কিছু এখানে দারিদ্রের কারণ নয়। সুতরাং শেষ কথা, মানুষ যেন জন্মসূত্রে দরিদ্র হতে না পারে, সে শর্ত সৃষ্টি করতে হবে; সকল মানুষ মানুষ হিসাবে সমান। সুতরাং বৈষম্য সৃষ্টির পথ বন্ধ করলেই তো সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। এটাই তো ছিল আমাদের স্বাধীনতা চিন্তার মর্মবস্তু। তাহলে সমস্যাটি কোথায়?

আমি আশা করছি, প্রবন্ধে উত্থাপিত প্রশ্ন ও প্রসঙ্গসমূহ আমরা বিশ্লেষণ করবো; বিশেষজ্ঞ মতামত জানতে পারবো। বাংলাদেশের দারিদ্রাবস্থা সম্পর্কে আমাদের করণীয় বিষয়াদি স্পষ্টতর হবে। স্বাধীন চিন্তা-চেতনা সমৃদ্ধ হবে। ফলে তা এদেশে মানবকল্যাণমুখী আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করবে। সংক্ষিপ্ততর হবে এদেশে দারিদ্র-বঞ্চনার ইতিহাস।